শিশু-কিশোরদের জন্য
মহান আল্লাহর পরিচয়

গোলাম রেযা হায়দারী আবহুরী
অনুবাদ : আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

আল্লাহ অভাবমুক্ত

'তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসিত।'– সূরা ইবরাহিম : ৮

আল্লাহ কি আমাদের নামাযের পড়ার জন্য অভাবী যে আমাদের প্রত্যেক দিন নামায পড়তে হবে ?

যদি তোমার শিক্ষক তোমাকে বলেন যে, তোমার পড়াগুলো ভালো কর পড়বে, তা হলে কি জন্য? অবশ্যই তুমি বলবে যে, আমি যাতে শিক্ষিত হতে পারি এবং আমার ভবিষ্যৎ ভালো হয় সে জন্য।

যদি পিতা-মাতারা তাঁদের সন্তানদের বলেন, খাবারের পাশাপাশি দুধ, সবজি এবং খোরমাও যেন খায়, কি জন্য? নিশ্চয় তুমি বলবে যে, তারা যাতে শক্তিশালী ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় সে জন্য। পার্কের সুন্দর ফুল গাছগুলোর অহরহ পানি ও বাতাস দরকার হয় সেটা কি জন্য? নিশ্চয় তুমি উত্তর দেবে যে, সেগুলো যাতে বড় হয় এবং যাতে ফুল বিকশিত হয়।

তাই আল্লাহও আমাদের থেকে চেয়েছেন আমরা যেন নামায পড়ি। এর উপকার তো আমাদের নিজেদেরই জন্য। নামায আমাদের অন্তরকে আলোকিত করে এবং আমাদের আত্মাকে পবিত্র রাখে। নামাযের কারণেই আমরা জীবনে সৎ, দয়াশীল, চরিত্রবান এবং আশাবাদী হতে পারি।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) নামাযকে একটি নদীর সাথে তুলনা করেছেন। যে নদীতে আমরা প্রত্যেক দিন পাঁচ বার গোসল করি এবং ধুলো-ময়লা থেকে পাক-সাফ হই। যে ব্যক্তি নামায পড়ে এবং প্রত্যহ পাঁচ বার আল্লাহর সাথে কথা বলে, সে মিথ্যা বলতে ভয় পাবে, বন্ধুদের কম কষ্ট দেয় আর খারাপ কথা কম বলে। আল্লাহ নামাযী ব্যক্তিকে তার কাজকর্মে সাহায্য করে থাকেন।

পবিত্র কুরআনের সূরা আনকাবুত এর ৪৫ নং আয়াতে এসেছে : 'নামায মানুষকে মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখে।' যদি নামাযী ব্যক্তি কোন পাপও করে তা হলে ক্রমে ক্রমে নামাযের কল্যাণে উক্ত মন্দ ও পাপ কাজ থেকে বিরত হয় এবং তওবা করে নেয়। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর আমলে এক যুবক ছিল যে মহানবী (সা.)-এর সাথে নামায পড়ত; কিন্তু কখনো কখনো পাপ কাজও করত। একদল লোক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এলেন এবং বললেন : 'হে নবীজী! এ যুবকটি কখনো কখনো জঘন্য পাপ কাজ করে থাকে।' রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের উত্তরে বললেন : 'অবশেষে একদিন তার নামাযই তার এসব কাজ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে আনবে।' বাস্তবে সেটাই ঘটল। ঐ পাপ কাজ করা যুবকটি কিছুদিন পর তওবা করল এবং যেসব মন্দ কাজ সে করত সেগুলো পরিত্যাগ করল।

আমাদের নামাযের জন্য আল্লাহর কোন অভাব নেই। আমরাই আমাদের সৌভাগ্য অর্জনের জন্য নামায পড়া এবং আল্লাহর সাথে কথোপকথন করার জন্য অভাবী। যদি মানুষ নামায না পড়ে, এমনকি তারা যদি সকলেই কাফের হয়ে যায়, তবুও আল্লাহর কোনই ক্ষতি হবে না। সূরা ইবরাহিম এর ৮ নং আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর কথা থেকে এসেছে : 'তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসিত।'

যে ফুল পানি পায় না এবং সূর্যের আলো পায় না, সে তো শুকিয়ে যায়। বেনামাযী লোকের আত্মাও কালো হয়ে যায় এবং আল্লাহর সাথে বন্ধুত্বের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়।

সবার প্রথম (আদি)

'তিনিই আদি।'– সূরা হাদীদ : ৩

বলা হয় যে, আল্লাহ প্রথম থেকে ছিলেন। এই 'প্রথম' বলতে কী বুঝায়?

আমরা যখন বলি, আল্লাহ প্রথম থেকেই ছিলেন, তখন কি আমরা নির্দিষ্ট কোন দিনকে বুঝিয়ে থাকি? উদাহরণস্বরূপ অমুক বছরের অমুক মাসের অমুক বার? বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের উদ্দেশ্য তা নয়। কারণ, আমরা যদি বলি, আল্লাহ অমুক দিন থেকে ছিলেন, তা হলে তৎক্ষণাৎ আমাদের মনে এ প্রশ্নের উদয় হয় যে, তা হলে ঐ দিনের আগে কি আল্লাহ ছিলেন না?

এক ব্যক্তি ইমাম বাকির (আ.)-কে জিজ্ঞেস করল : 'আমাকে বলুন দেখি, আল্লাহ কবে থেকে ছিলেন?' ইমাম তাকে বললেন : 'তার আগে তুমি আমাকে বল দেখি, আল্লাহ কবে ছিলেন না? তখন আমি তোমাকে বলব কবে থেকে ছিলেন।'

ইমাম ঐ লোকটিকে এ কথা বুঝাতে চাচ্ছিলেন যে, আল্লাহ সর্বদা ছিলেন। তাই যদি কেউ বলে, আল্লাহ অমুক দিন থেকে ছিলেন এবং তার আগে ছিলেন না, তা হলে নির্ঘাত তার কথা সঠিক নয়।

পুত্র আমার!

আমরা যখন বলি যে, মুমিনগণ সর্বদা বেহেশতে থাকবে, এই সর্বদা থাকা কোন্ সময় পর্যন্ত বুঝায়? এটা সবারই জানা যে, এখানে নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা, যেমন অমুক বছরের অমুক মাসের জুমআর দিন পর্যন্ত বুঝায় না। অপরদিকে আমরা যখন বলি, আল্লাহ প্রথম থেকেই ছিলেন, তখন নির্দিষ্ট কোন দিনকে আমরা বুঝাই না। সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, বছর ইত্যাদি তো আল্লাহর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। একটি জন্মদিন থাকা কিংবা উৎপত্তির একটি নির্দিষ্ট তারিখ থাকা এসবই হল আল্লাহর সৃষ্টিরাজির বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আল্লাহর কোন জন্মদিন কিংবা শুরুর তারিখ নেই।

আর এই যে ধারণা, আল্লাহ অমুক দিনে অস্তিত্ব লাভ করেছেন, এটি একটি অমূলক ধারণা। কারণ, এর অর্থ দাঁড়ায় ঐ তারিখের পূর্বে আল্লাহ ছিলেন না। আল্লাহ যদি এক সময়ে অস্তিত্ববান থাকবেন, আর অন্য সময়ে অস্তিত্ববান থাকবেন না, যদি এমন হতে হয়, তা হলে তিনি তো সবার স্রষ্টা আল্লাহ নন।

আর পবিত্র কুরআনে যে ইরশাদ হয়েছে : 'তিনিই আদি'– এর অর্থ হলো এ বিশ্বজগতে তুমি যা কিছুকেই আদি বলে চিন্তা করবে, আল্লাহ তারও পূর্বে ছিলেন।

মহানবী (সা.)-এর উত্তম শিক্ষামালা

(৫২ পাতার পর)

মহানবী (সা.) এবং একজন বেদুইন

একজন বেদুইন মদিনায় প্রবেশ করল এবং সরাসরি মসজিদে নববীতে চলে গেল যাতে সে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছ থেকে কিছু অর্থ সাহায্য পেতে পারে। মসজিদে পৌঁছে সে তখন দেখতে পেল মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবিগণকে সাথে নিয়ে বসে আছেন। সে মহানবীর কাছে সাহায্য চাইল। তিনি তাকে কিছু পরিমাণ অর্থ দান করলেন। কিন্তু বেদুইন লোকটি তাতে সন্তুষ্ট হল না। উপরন্তু সে তাঁর সাথে রুক্ষ ব্যবহার করল এবং অসংযত ভাষায় কথা বলল। মহানবীর সাহাবিগণ বেদুইনটির ওপরে খুবই রেগে গেলেন এবং তাকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) তাঁদেরকে তা থেকে বিরত করলেন।

পরবর্তী দিন মহানবী (সা.) সেই বেদুইনকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং তাকে আরও কিছু অর্থ দিলেন। বেদুইন লোকটি দেখল যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর বাড়ি অন্য রাষ্ট্রপ্রধানদের মতো নয়; বরং বাড়ির জিনিসপত্র খুবই সাধারণ এবং সেখানে কোনো ধরনের বিলাসসামগ্রী নেই। বেদুইনটি তার অর্থ পেয়ে খুশি হলো এবং মহানবীকে ধন্যবাদ জানালো।

এবার মহানবী (সা.) তাকে বললেন : 'তুমি গতকাল একটি রূঢ় শব্দ উচ্চারণ করেছিলে যা আমার সাহাবিদের ক্রোধের উদ্রেক করেছিল। আমি আশংকা করছি যে, তারা তোমাকে প্রহার করতে পারে। তুমি কি তাদের সামনে তোমার অনুতাপ প্রকাশ করতে পারবে, যাতে তাদের ক্রোধ প্রশমিত হয়ে যায় আর তারা তোমাকে প্রহার না করে?' বেদুইনটি জবাব দিল : 'অবশ্যই।'

পর দিন বেদুইনটি মসজিদে উপস্থিত হলো। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সাহাবিগণেকে বললেন : 'এই ব্যক্তি বলেছে, সে তার অংশ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে। এটি কি সত্য?' বেদুইনটি বলল : 'জী, এটি সত্য।' অতঃপর সে মহানবী (সা.)-এর সাহাবিগণের সামনে অনুতাপ প্রকাশ করল এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথিরাও খুশি হলেন। মহানবী (সা.) তাঁদেরকে বললেন : "আমার এবং এই ধরনের ব্যক্তিদের দৃষ্টান্ত হলো ওই ব্যক্তির মতো যার উট তার নিকট থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল। লোকজন মালিককে সাহায্য করতে পারবে ভেবে উটটির পেছনে ছুটতে লাগল। কিন্তু উটটি ভয় পেয়ে আরও দ্রুত গতিতে ছুটতে শুরু করল। উটের মালিক লোকদেরকে ডেকে বলল : 'আমার উটকে একা ছেড়ে দাও, আমিই ভালো জানি কীভাবে একে শান্ত করতে হবে।' যখন লোকগুলো উটের পেছনে দৌড়ানো বন্ধ করল তখন মালিক শান্তভাবে একমুঠো ঘাস নিয়ে উটটির পেছনে পেছনে এগোতে লাগল। এরপর কোনো প্রকারের দৌড়ানো বা চিৎকার করা ছাড়াই উটটিকে ঘাস দেখালো। উটটি ঘাস দেখে আস্তে আস্তে উটের মালিকের কাছে চলে এলো।"

অনুবাদ : সরকার ওয়াসি আহম্মেদ

মহানবী (সা.)-এর উত্তম শিক্ষামালা

সব সময় সত্য কথা বলা

সত্য কথা বলা একটি খুবই ভালো অভ্যাস। যদি তুমি সব সময়ই সত্য কথা বল, তা হলে তুমি নিজেকে অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবে। এখানে এমন এক লোকের কাহিনী বর্ণনা করব, যে ব্যক্তি জীবনে অনেক মন্দ কাজ করেছিল। কিন্তু অবশেষে এই লোকটিই সত্য কথা বলার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মাধ্যমে নিজেকে মন্দ কাজ করা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ঘটনাটি ছিল এমন :

একদিন এক লোক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে এল এবং বলল : 'হে আল্লাহ্‌র নবী (সা.)! আমার অনেক মন্দ অভ্যাস আছে। আমি সেগুলোর মধ্যে প্রথমে কোনটি পরিত্যাগ করব?' মহানবী (সা.) বললেন : 'তুমি মিথ্যা কথা বলা ছেড়ে দাও এবং সবসময় সত্য কথা বলা শুরু কর।' লোকটি তা করার প্রতিশ্রুতি দিল এবং বাড়িতে চলে গেল। একদিন রাতের বেলা লোকটি চুরি করার জন্য বাড়ির বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। বাড়ি থেকে বের হওয়ার পূর্ব মুহূর্তেই মহানবী (সা.)-কে দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা তার স্মরণে আসল। সে মনে মনে চিন্তা করল– যদি আগামী কাল মহানবী (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি কোথায় ছিলাম, তা হলে আমি কী বলব? আমি কি বলব যে, আমি চুরি করতে গিয়েছিলাম? না, আমি তো তা বলতে পারব না। আবার আমি তো মিথ্যা কথাও বলতে পারব না। আর যদি আমি সত্য কথা বলি, তবে সবাই আমাকে ঘৃণা করা শুরু করবে এবং আমাকে চোর বলে ডাকবে। অন্য দিকে চুরি করার জন্য আমি শাস্তিও পাব।

এজন্য লোকটি সিদ্ধান্ত নিল যে, সে আর চুরি করবে না। এভাবে সে তার চুরির অভ্যাস ত্যাগ করল। এরপর এক দিন তার মদ পানের ইচ্ছা করছিল। যখন সে তা পান করতে উদ্যত হলো তখন নিজেকে বলল, আমি কী উত্তর দেব যদি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, দিনের বেলায় আমি কী করেছি? আমি তো মিথ্যা কথা না বলার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছি এবং যদি আমি সত্য কথা বলি তা হলে লোকেরা আমাকে ঘৃণা করবে। কারণ, একজন মুসলমানের মদ পান করার অনুমতি নেই।

এ কথা চিন্তা করে সে মদ পান ত্যাগ করল। এভাবে যখনই লোকটি কোনো মন্দ কাজ করার চিন্তা করত তখনই সে সর্বদা সত্য বলার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করত। এভাবে একটি একটি করে সে তার সকল মন্দ অভ্যাস ছেড়ে দিল এবং একজন ভালো মুসলমান তথা ভালো মানুষে পরিণত হলো।

এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, যদি তুমি সর্বদা সত্য কথা বল, তা হলে তুমি একজন ভালো মানুষ– ভালো মুসলমান হয়ে যাবে। আল্লাহ তোমাকে পছন্দ এবং অনুগ্রহ করবেন। যদি আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ আমাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকেন তবে তিনি আমাদেরকে জান্নাতের মাধ্যমে পুরস্কৃত করবেন।

গল্পের শিক্ষণীয় বিষয় : আমি সর্বদা সত্য বলব এবং কখনই মিথ্যা কথা বলব না।

সালাম (আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলা!

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একদিন তাঁর সাহাবিগণকে নিয়ে বসে কথা বলছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁদের অনুমতি ছাড়াই সেখানে প্রবেশ করল, এমনকি সে সালাম বিনিময়ও করল না। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করলেন : 'তুমি কেন সালাম বিনিময় করলে না? আর এখানে প্রবেশ করার জন্য অনুমতিও চাইলে না?' এরপর মহানবী (সা.) তাঁকে নির্দেশ দিলেন : 'তুমি ফিরে যাও। এখানে প্রবেশের পূর্বে আমাদের অনুমতি গ্রহণ কর এবং সালাম (আমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) বিনিময় কর।'

সালামের বিষয়ে মহানবী (সা.) আমাদের উদ্দেশে বলেছেন : 'হে মুসলমানগণ! তোমরা একে অপরের প্রতি বিনীত না হলে জান্নাতে প্রবেশ করবে না– যখন তোমরা একে অপরকে দেখ এবং সালাম বিনিময় না কর। সব সময় জোরে সালাম দেবে এবং জবাবও একই ভাবে দেবে। যে প্রথম সালাম দেয় আল্লাহ তাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন এবং তাকে উত্তম পুরস্কারও দান করেন। প্রথমে তুমি সালাম দাও। অতঃপর তুমি যা বলতে চাও তা বল।'

মহানবী (সা.) বলেছেন : 'তোমরা যখন একে অপরের সাথে দেখা কর তখন শুভেচ্ছা (সালাম) বিনিময় কর এবং কোলাকুলি কর। আর যখন তাদের থেকে দূরে চলে যাও তখন ক্ষমা চেয়ে প্রস্থান কর।'

ইমাম হুসাইন ইবনে আলী (আ.) বলেন : 'যে সালাম দেয় তার অংশ হিসেবে সত্তরটি পুরস্কার এবং যে সালামের জবাব দেয় তার জন্য রয়েছে একটি পুরস্কার।' (অর্থাৎ যখন দু'ব্যক্তি একে অপরকে দেখে সালাম বিনিময় করে তখন যে প্রথমে বিষয়টি শুরু করে সে বৃহত্তর পুরস্কার লাভ করে।)

ইমাম সাদিক (আ.) বলেন : 'যে সালাম বিনিময় শুরু করে সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নিকট অধিকতর পছন্দনীয় ব্যক্তি।'

বাকি অংশ ৫১ পাতায় দেখুন

ছড়া-কবিতা

মায়ের দরদ
আ.শ.ম. বাবর আলী

এ জগতে অনেকেই
স্বার্থ নিয়ে থাকে,
একমাত্র নিঃস্বার্থ
দেখি শুধু মাকে ।

সন্তানের শান্তি তরে
অস্থির সদা মায় ।
সন্তানের সুখ ছাড়া মা
আর কিছু না চায় ।

সন্তান কষ্ট পেলে
অস্থির মার বুক,
ত্যাগ করেন সন্তান তরে
নিজের সব সুখ ।

বুকের মানিক চোখের মণি
সন্তান মা'র কাছে
মায়ের মতন দরদ এমন
আর কারো কি আছে ?

আমাদের গাঁ
মিতুল সাইফ

মায়ের সবুজ আঁচল যেমন তেমনি আমার মাঠ
মাঠের পাশেই নদীর ওপার গাঙশালিকের হাট ।
মায়ের কালো চোখের মতন নদীর কালো জল
রোদের আলোয় ঝিকিমিকি খেলে ছলাৎছল ।

কাশের বনে বাঁশের বনে উদাস হাওয়া বয়
এই মাটি এই গাঁ আমাদের এই তো পরিচয় ।
সূর্য ওঠে আমার মায়ের ঠোঁটের মত লাল,
এই মাটিতে কাঁদি হাসি আমরা চিরকাল ।

আমার বুবুর হাতের চুড়ি বাজে ঝুন ঝুন
অন্য রকম ভালো লাগা– সে যে কী দারুণ ।
এই গাঁয়েরই খোকন আমি, এই তো আমার গাঁ,
গাঁ নয় রে গাঁ নয় রে, এ আমাদের মা ।

সবুজের হাসি
নাসির উদ্দিন সরদার

আমাদের দেশে আছে
সবুজের হাসি
তাই তো এ দেশটাকে
এতো ভালোবাসি ।

ফুল ফোটে পাখি গায়
এ দেশের বনে
সুবাসিত বায়ু এসে
দোল দেয় মনে ।

পাতায় পাতায় বাজে
বাতাসের সুর
আলোর মিনার হাসে
সকাল দুপুর ।

মাঠ ভরা পাকা ধান
সোনালি বরণ
রূপসী এ বাংলায়
রূপের স্ফুরণ ।

ভাইটি আমার লেখক হবে
মাহিন মুবাশশির

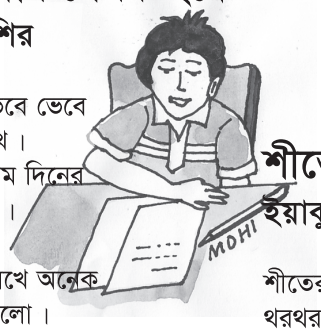

ভাইটি আমার ভেবে ভেবে
সারাটা দিন লেখে ।
লিখে লিখে আগাম দিনের
হরেক স্বপ্ন দেখে ।

ভাইটি আমার লেখে অনেক
লেখার মানটা ভালো ।
লেখনী তার আনবে জোয়ার
মুছবে আঁধার কালো ।

ভাইটি আমার লেখক হবে
ভাইটি হবে কবি ।
ভাইটি হবে নজরুল বা
ভাইটি হবে রবি ।

শীতের দিনে
ইয়াকুব আলী রনী

শীতের ভোরে কাঁথা মুড়ে
থরথর করে কাঁপছি,
দাদু বানায় শীতের পিঠা
এই কথাটা ভাবছি ।
শীতের দিনে খেজুর রস
খেতে লাগে ভালো,
উঠানে জমবে গল্প
সূর্য দেবে আলো ।
শিশির ভেজা দুর্বা ঘাসে
ফড়িং এসে নাচে,
শীতের পাখি গাইবে গান
বসে সবুজ গাছে ।
শীত আমাদের প্রিয় ঋতু
আনন্দে বেশ কাটে,
শীতকালটা চলে গেলে
ভাল্লাগে না মোটে ।

কাজের পাখি
বোরহান মাসুদ

এই শহরে অনেক পাখি
কাজের পাখি কয়টা আছে ভালো ।
কাজের পাখি যারাই আছে
তাদের বলো ছিঃ বিশ্রী কালো ।

কাজের বেলায় যে পাখিটি দেয় না ফাঁকি রোজ
তোমরা কি তার খাবার বেলায় একটু রাখো খোঁজ ।
কাজের পাখি কাক পাখিকে আসল নামেই ডাকো
কেন তারে তুচ্ছ ভেবে কাউয়া বলে থাকো?

কাক পাখি যে অনেক ভালো অনেক আশার আলো
চোখের দেখায় রঙটা শুধু একটু বেশি কালো ।
ময়লাগুলো তোমার কাছে জানি ভীষণ বাজে
সেই ময়লা দূর করতে কাক নেমে যায় কাজে ।

কাজের পাখি কাক পাখি যে– হোক রঙ তার কালো
অসুন্দরে দূর করে সে ডাকে ভোরের আলো ।

দাড়ির চিন্তা

মাহদী অযার ইয়াযদী
অনুবাদ : কামাল মাহমুদ

অনেক দিন আগের কথা। হযরত মূসা (আ.)-এর সময়কালে একজন ইবাদতকারী ছিলেন যিনি দিন-রাত ইবাদত করতেন। কিন্তু নিজেই বুঝতে পারতেন, তাঁর নামায-দোয়া কিছুই কাজে আসছে না। তিনি মনে করতেন লম্বা দাড়ি রাখলে নিজেকে আল্লাহওয়ালা হিসেবে জাহির করা যায়। নিজে নিজে বলতেন : 'এতে তো কোন দোষ নেই। আমার তো দুনিয়ায় কোনো কিছু চাওয়ার নেই। আমার সমস্ত মন-প্রাণ তো খোদার জন্যই নিবেদিত। তবুও আমার নিজের বিশ্বাস হয় না যে, আল্লাহ আমার ইবাদত কবুল করছেন কি না?'

একদিন হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে দেখা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : 'হে মূসা (আ.)! আমার বিষয়টি একটু শুনুন। আমার নামায ও ইবাদত কেন আমাকে স্বস্তি দেয় না? আমার মধ্যে কোনো শুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না? যেহেতু আপনি তূর পাহাড়ে গিয়ে আল্লাহর সাথে কথা বলেন, আপনি আল্লাহকে জিজ্ঞেস করবেন যে, আমি কেন ইবাদতে আগ্রহ পাই না? কেন আমার চোখে পানি আসে না? কেন আমার হৃদয়ে খোদার মুহব্বতের কারণে ঠোঁটে তাঁর নাম জপিত হয় না? কেন আমার হৃদয় পরিচ্ছন্ন হয়ে খোদার ভয়ে কেঁপে ওঠে না? আমি তো আমার অন্য বন্ধুদের মতো ইবাদত করি; তবুও আমার এ অবস্থা কেন?'

মূসা (আ.) বললেন : 'ঠিক আছে, জিজ্ঞেস করব।'

যখন মূসা (আ.) আল্লাহকে ঐ ব্যক্তির ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন তখন তাঁর কাছে গায়েবী আওয়াজ আসলো : 'হে মূসা! এটা ঠিক যে, ঐ লোকটি অন্য লোকদের মতো দিন-রাত ইবাদত করে। কিন্তু ঐ ব্যক্তির একটি জিনিসের অভাব আছে আর তা হলো 'ইখলাস' বা একাগ্রতা। প্রত্যেক কাজের পূর্ণতার জন্য শর্ত হলো একাগ্রতা। মানুষের কাজে একাগ্রতা এবং একটি জিনিসের প্রতি মন নিবদ্ধ থাকা উচিত। একাগ্রতার জন্য পাহাড় বা মরুভূমিতে থেকে ধ্যান করতে হবে তা নয়; বরং যে কোন স্থান থেকেই তা করা সম্ভব। অধিকাংশ মানুষ সংসারে মানুষের মাঝে বসবাস করে, কিন্তু আল্লাহর সাথে সংযুক্ত থাকে। একাগ্রতা তাদের কাজে আগ্রহ এনে দেয়। কিন্তু ঐ লোক পূর্ণাঙ্গভাবে খোদামুখী নয়। তার মনের একাংশ জুড়ে আছে তার সুন্দর দাড়ি। সে সর্বদা দাড়ির চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। সে সব সময় দাড়ি আঁচড়ায়। যখন সে সেজদায় যায় তার মনে এই সংশয় জাগে যে, তার দাড়ি মাটিতে পড়ে ধুলা লেগে যায় কি না? যখন কেউ তার সাথে দেখা করতে যায় সে দাড়ি পরিপাটি করে। যখন আয়নার সামনে দাঁড়ায় তখন আমি যে তাকে দেখার জন্য চোখ দিয়েছি তার শুকরিয়া না করে সে আত্ম প্রশান্তি লাভ করে যে, তার সুন্দর দাড়ি আছে, যা সে সব সময় পরিপাটি করে রাখে। যদিও সে খোদার ইবাদত করে, অনেক দোয়া মোনাজাত করে; কিন্তু তার এই দোয়া খোদা এবং তার মধ্যকার দূরত্ব ঘোচাতে পারে না। তার মনপ্রাণ জুড়ে থাকে দাড়ির চিন্তা। তার সাথে এই লোকের কি পার্থক্য আছে যে সারাক্ষণ টাকা-পয়সার চিন্তায় থাকে? একজন তার মান-মর্যাদার চিন্তায় মশগুল আর একজন দাড়ির প্রদর্শনীতে ব্যস্ত। তার মধ্যে একাগ্রতা নেই এবং সে খোদাকে একনিষ্ঠভাবে ডাকে না এবং তার হৃদয়ও পরিচ্ছন্ন নয়। এজন্য সে ইবাদতে আগ্রহ পায় না। এমনকি নিজের ইবাদতে নিজেরই বিশ্বাস হয় না।'

মূসা (আ.) তূর পাহাড় থেকে ফিরে এসে ঐ লোককে বললেন : 'তুমি এক কাজ করো। যখন ইবাদত করবে তখন আল্লাহ ছাড়া আর কিছু ভাববে না। তুমি যদি পড়াশোনা একাগ্রতার সাথে করবে তখন জামা কাপড় বেশ-ভূষার দিকে নজর দেবে না। যদি তুমি পড়ার সময় পোশাক নিয়ে ব্যস্ত থাক তা হলে পড়াশোনা আয়ত্ত করতে পারবে না। যদি তুমি কবিতা মুখস্থ করতে চাও কিংবা কোন সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করতে চাও তা হলে তুমি একাগ্রচিত্তে তাতে মনোনিবেশ কর, তা না হলে এর কোনো কিছুই তোমার যথাযথভাবে হবে না। সর্বোপরি তুমি সব সময় তোমার এই দাড়ির চিন্তা বাদ দাও।

ইবাদতকারী ঐ লোকটি এ কথা শুনে লজ্জিত হলো এবং কাঁদতে কাঁদতে বলল : 'ঠিকই তো। আসলেই আমি এ কাজটি করি। আমি সব সময় আমার দাড়ির চিন্তায় ছিলাম। আমি ইবাদত করতাম ঠিকই, কিন্তু আমার মন থাকত দাড়ির দিকে। কীভাবে আমার দাড়ি আন্দোলিত হয়, তাই ভাবতাম। আমার এই দাড়ি না থাকলে আমার মন একাগ্রচিত্ত থাকত।

আবেদ লোকটি তার দাড়ির জন্য অসন্তুষ্ট হয়ে দাড়ি মুষ্টিবদ্ধ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল : 'আমার সকল অসফলতার পেছনে এই দাড়ি। আমি এই দাড়ি চাই না।'

হযরত মূসা (আ.)-এর মনে আবেদের এই কান্না প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। তখন জিবরাইল (আ.) অবতরণ করে মূসা (আ.)-কে বললেন : 'হে মূসা! এখন সে খোদার ইবাদতের বিষয়টি বুঝতে পেরেছে, তবুও দাড়ি থেকে তার হাত নামছে না। এতকাল সে দাড়ি পরিপাটি করার চিন্তায় ছিল। এখন সে দাড়ি উপড়ে ফেলার চিন্তায় আছে। কিন্তু দাড়ির তো কোন দোষ নেই। দোষ হলো তার কাজে একাগ্রতা নেই। অনেক মানুষের দাড়ি আছে, কিন্তু তারা দাড়ি নিয়ে ব্যস্ত নয়। তারা কাজের চিন্তায় নিমগ্ন। তারা সব কাজ ঠিকঠাক করতে পারছে। যারা দাড়ি, কাপড়-চোপড় বা অন্যান্য জিনিসের চিন্তায় থাকে তারা কোন কাজে মজা পায় না এবং কোন কাজ থেকে ফল লাভ করতে পারে না।'

খুকি ও নেংটি ইঁদুর

বিএম বরকতউল্লাহ্

এক সেকেন্ডেরও কম সময়। বিড়ালটা পুঁচকে ইঁদুরটাকে ধরতে পারে নি। নইলে এতক্ষণে বিড়ালের পেটে চলে যেত হতভাগা নেংটি ইঁদুর। এক দৌড়ে ইঁদুর তার গর্তে ঢুকে গেল। আর বিড়াল ওৎ পেতে বসে আছে গর্তের কিনারে। নয় বছরের খুকি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওসব দেখছে আর ভাবছে ভয়ে লুকিয়ে থাকা অসহায় ছোট্ট ইঁদুরটির কথা।

ছোট্ট একটা প্রাণী ইঁদুর। কত বিপদের মধ্যে বেঁচে আছে সে! তার চারপাশে অসংখ্য শত্রু। তার গর্তটি ছাড়া আশ্রয় নেওয়ার আর কোন জায়গা নেই। মানুষেরা দেখলে লাঠি নিয়ে তাড়ায়, কুকুর-বিড়াল তাকে দেখলে তাড়া করে। সাপে দেখলে ছোবল মেরে খেয়ে ফেলে। কাক-পেঁচারা দেখলে ছোঁ মেরে নিয়ে খেয়ে ফেলে।

কই, তার বন্ধু বলতে তো কেউ নেই! তার বিপদে এগিয়ে আসারও কেউ নেই। তার সমস্যায় সাহায্য করবে তো দূরের কথা, সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কেউ নেই। কী ভয়ংকর আর বিপজ্জনক জীবন এই ছোট্ট ইঁদুরের! তার ঘর-সংসার আছে। তার ছেলেমেয়ে আছে। তাকে কাজ করে খেতে হয়। তার ছেলেমেয়ে বড় না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে খাওয়াতে হয়। তারপরও ইঁদুররা বেঁচে আছে! কী করে সম্ভব?

নেংটি ইঁদুরের এত বিপদ আর কষ্টের মধ্যে বেঁচে থাকার কথা চিন্তা করে খুকির মাথা গরম হয়ে যায়। সে ভাবে, আমি মা-বাবার আদুরে সন্তান। আমার চারপাশে যা কিছু আছে সবই আমার জন্য। আমার কোনো দুঃখ নেই, শত্রু নেই। সবাই আমার বন্ধু। আমি যখন যা চাই কত সহজেই তা পেয়ে যাই। যা চাই না তাও পাই। আমার যা আছে তা আমার প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি। আমি খেতে না চাইলে আমাকে আদর করে খাইয়ে দেয়। কষ্ট যে কী জিনিস তা আমি জানি না। বিপদ আর সমস্যা কি তাও বুঝিনি। আমি কাঁদতেও পারি না। সবাই আমাকে আদর করে খুশি করে রাখে। আমি একটি ননীর পুতুল! আর ইঁদুরটি?

আমি তো মানুষ। আমি কেন এত আরাম করছি? কেন আমি অন্যের ওপর ভর করে থাকব? কেন আমি নিজের কাজ নিজে করছি না? আমি ইচ্ছা করলে কি আমার কাজ আমি করতে পারি না? কেন পারব না। আমাকে পারতেই হবে।

খুকি কি ইঁদুর হয়ে গেল?

পরের দিন শুক্রবার। ঘুম থেকে উঠে কাজের মেয়ের চোখ গোল হয়ে গেল। সে এক দৌড়ে খুকির মা-বাবার ঘরে গেল। খালাম্মা, খালু তাড়াতাড়ি ওঠেন। দেখে যান কি আজব কাণ্ড! ওঠেন, ওঠেন।

তাঁরা ধড়ফড়িয়ে উঠে চোখ কচলাতে কচলাতে বললেন : 'কী হয়েছে, তুই এভাবে ডাকাডাকি করছিস যে!'

–'দেখেন, খুকি এসব কী করছে!'

খুকি আপন মনে নিজের কাজগুলো নিজের হাতে করছে। সে তার টেবিল গুছিয়ে নিল। সে তার ছোট্ট রুমটা ঝাড়ু দিয়ে নিল। তারপর সে তার ছোট ছোট জামাগুলো নিয়ে গেল কল পারে। সে নিজেই কাপড় ধুয়ে উঠানের তারে ছড়িয়ে দিতে গেল। সে তারের নাগাল পাচ্ছিল না। ঘর থেকে একটি টুল টেনে বের করে নিয়ে গেল উঠানে। সে তার কাপড়গুলো সুন্দর করে তারে ছড়িয়ে দিয়ে তাতে ক্লিপ এঁটে দিল। তারপর গামছায় হাত মুছতে মুছতে হাতে ঝাড়ু নিয়ে উঠান ঝাড়ু দিতে লাগল।

খুকির বাবা পাখির মতো উড়ে এসে তার হাত থেকে ঝাড়ুটা কেড়ে নিয়ে বললেন : 'মা! তুমি এগুলো কী করছ? এসব তো তোমার কাজ নয় মা। এই যে সকালবেলা ঠাণ্ডা পানিতে কাপড় ধুলে তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে মা। এসব কাজ করার জন্য তো আমাদের কাজের লোক আছে। তুমি হঠাৎ করে এতসব কাজ শুরু করে দিলে, তোমাকে কি কেউ কিছু বলেছে? আমাকে বল, তার কঠিন বিচার হবে।

–'বাবা, আমাকে কেউ কিচ্ছু বলে নি। প্লিজ, ঝাড়ুটা দাও তো। ঘরে গিয়ে বস। দেখ, আমি সুন্দর করে এই কাজগুলো করতে পারি। যাও, যাও।' এই বলে খুকি তার বাবাকে ঠেলে ঘরে পাঠিয়ে দিল। খুকির মা এক ধরনের তৃপ্তির হাসি দিয়ে বাবা-মেয়ের ঝগড়া শুনছেন।

খুকি উঠান ঝাড়ু দিয়ে ঘরে এসে টেবিলে বই নিয়ে পড়তে বসে গেল। তার মা এক গ্লাস দুধ নিয়ে তার সামনে ধরে বললেন : 'মা, আমার লক্ষ্মী মা! তুমি অনেক পরিশ্রম করেছ, এই নাও তোমার পুরস্কার।'

খুকি দুধে চুমুক দিল। তার মা বললেন : 'কাজ করা ভালো, তবে তুমি এখন অনেক ছোট। তোমার কাজগুলো করে দেয়ার জন্য তো কাজের লোকই আছে। তুমি মন দিয়ে পড়ালেখা কর। তোমাকে কাজ করতে হবে না।'

–'মা, আমি আমার কাজগুলো নিজেই করব। লেখাপড়া করেই এসব কাজ করা যায়। এখন থেকে আমার কোনো কাজে বাধা দিতে পারবে না। দেখ, আমি পারি কি না।'

মা মুচকি হাসি দিয়ে চলে গেলেন। খুকির মা খুকির বাবার সামনে গিয়ে খুকির মতো করে বললেন : 'লেখাপড়া করেই এসব কাজ করা যায়। এখন থেকে আমার কোনো কাজে বাধা দিতে পারবে না। দেখ, আমি পারি কি না।' বলেই দু'জন হা হা করে হাসতে লাগলেন।

খুকি তার রুম থেকে ছুটে গিয়ে তার বাবা মাকে আঙুল খাড়া করে বলল : 'এখন থেকে আমাকে এত আদর করবে না। আমার কাজে কোন সাহায্য করবে না। আমাকে খাইয়ে দেবে না। আমি কারো সাহায্য নেব না। আমি একাই স্কুলে যাব। আমার ব্যাগ আর কারো হাতে দেব না; আমি কাঁধে করে নিয়ে যাব। আমি আমার সকল কাজ নিজের হাতে করব। আমি আমার কাপড় নিজেই ধুব। আমি হেঁটে হেঁটে স্কুলে যাব।'

মা-বাবা কৌতূহল নিয়ে বললেন : 'আচ্ছা মা, তুমি হঠাৎ করে এতটা পরিবর্তন হয়ে গেলে কেন? কী হয়েছে তোমার? বল তো শুনি।'

–'না, আমার কিছুই হয় নি। আমি নেংটি ইঁদুর থেকে শিখেছি নিজের কাজ নিজেই করতে হয়।। কিচ্ কিচ্ কিচ্।'

সাইক্লিং

অনুবাদ : সরকার ওয়াসি আহম্মেদ

কর্মক্ষম এবং সক্ষম থাকার জন্য তোমার শারীরিকভাবে সুস্থ থাকা প্রয়োজন। নিয়মিত শারীরিক কাজ-কর্ম সম্পাদন তোমাকে বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক রোগ, যেমন স্থূলতা, হৃদরোগ, ক্যান্সার, মস্তিষ্কের রোগ, ডায়াবেটিস এবং বাত রোগ ইত্যাদি প্রতিরোধে সাহায্য করে। নিয়মিত সাইকেল চালানো তোমার স্বাস্থ্য ঝুঁকিকে হ্রাস এবং অলস বসে থাকার ফলে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয় সেগুলো দূর করার অন্যতম ভালো উপায়।

সাইক্লিং একটি স্বাস্থ্যকর শারীরিক কসরত, যা সকল বয়সের মানুষের জন্যই আনন্দদায়ক। অর্থাৎ বালক থেকে শুরু করে বয়স্ক যে কোনো ব্যক্তির জন্যই তা আনন্দদায়ক। এটি একটি মজাদার ও কম ব্যয়সাপেক্ষ ব্যয়াম এবং একই সাথে পরিবেশেরও কোনো ক্ষতি করে না।

কর্মক্ষেত্রে বা দোকানে যাওয়া-আসা প্রভৃতি দৈনন্দিন কার্যাবলির সাথে সাথে ব্যয়াম করারও অন্যতম কার্যকরী উপায় হলো সাইক্লিং। বিশ্বে প্রতিদিন এক বিলিয়ন লোক বিনোদন লাভ ও খেলার জন্য সাইকেল ব্যবহার করে থাকে।

সুস্থ এবং কার্যক্ষম থাকার জন্য সাইক্লিং : স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য প্রতি সপ্তাহে দুই থেকে চার ঘণ্টা ব্যয়ামের জন্য প্রয়োজন হয়। আর সাইক্লিং এর মাধ্যমে এ কাজটি সহজেই করা যায়। সকল বয়সের মানুষের জন্য সাইক্লিংয়ের উপকারিতাগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

মাংসপেশীর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ও সুদৃঢ় করা : সাইক্লিং মাংসপেশীকে অধিকতর কার্যক্ষম করে তোলে। সাইক্লিংয়ের ফলে উরু ও শরীরের নিচের অংশ সুগঠিত হয় এবং এটি পেটের মাংসপেশীর গঠনেও সাহায্য করে।

শরীরের ওজনে ভারসাম্য বজায় রাখা : সাইক্লিং মানুষের মেটাবোলিক রেটকে বৃদ্ধি করে। ফলে তার শরীরের ওজন বৃদ্ধি পায় না।

শারীরিক সক্ষমতা ধরে রাখা : যারা নিয়মিত সাইক্লিং করে তারা অন্যদের তুলনায় দশ গুণ বেশি সক্ষম থাকে।

শক্তি এবং দমের জন্য উত্তম : সাইক্লিং দম, শক্তি এবং শ্বসনের ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

শরীরের ওপর স্বল্প চাপ সৃষ্টি : সাইক্লিংয়ে অন্যান্য ব্যয়ামের চেয়ে শরীরের ওপর চাপ কম পড়ে এবং এতে চোটের পরিমাণও তুলনামূলকভাবে কম হয়ে থাকে।

স্বাস্থ্যসম্মত থাকার একটি চমৎকার উপায় : অন্যান্য শারীরিক ব্যয়াম ঘরের ভেতরে করতে হয় বা বিশেষ সময় বা স্থানের প্রয়োজন। আর এগুলোতে একঘেয়েমি চলে আসতে পারে। সে তুলনায় সাইক্লিংয়ে উঁচু স্থান থেকে নিচে নামার সময় বা বাইরে ঘোরাঘুরিতে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাতে সাইক্লিংয়ের প্রতি মানুষের আকর্ষণ আরো বেড়ে যায়। সে নিয়মিত এটি উপভোগ করার জন্য সাইক্লিং করে থাকে। ফলে সে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে পারে।

সহজসাধ্য : অন্যান্য খেলাধুলার মতো সাইক্লিংয়ে উচ্চ মাত্রার শারীরিক দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। অনেক লোকই বাইসাইকেল আরোহণ কারতে জানে এবং তুমি যদি একবার এটি শিখে ফেল তবে জীবনে কখনই তা ভুলবে না।

সময়ের সদ্ব্যবহার : যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে মোটর যানবাহন, যেমন ট্রেন বা বাসে অলস বসে থাকার পরিবর্তে সাইকেল ব্যবহার করলে সেই সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ গন্তব্যে যেমন পৌঁছানো যায় তেমনি ব্যয়ামের কাজটিও সম্পন্ন করা যায়।

শিশু-কিশোরদের জন্য সাইক্লিং : সাইক্লিং শিশু-কিশোরদের জন্য খুবই উত্তম। শিশুদের জন্য প্রতিদিন ১ ঘণ্টা শারীরিক পরিশ্রম করার যে পরামর্শ দেয়া হয়েছে সাইক্লিংয়ের মাধ্যমে তা করা যায়। আবার শিশুরাও সাইক্লিংকে খুব উপভোগ করে। এমনকি বাবা-মায়েদের ওই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার নেই যে বয়সে শিশুরা নিজেরাই বাইসাইকেলে চড়তে পারে। বাবা-মারা অল্প টাকা খরচ করে সাইকেল কিনলে এ থেকে শিশুরা অপরিসীম উপকার লাভ করতে পারে। অল্প বয়সে সাইক্লিং শুরু করলে শিশুরা শারীরিকভাবে সক্ষম ও পরিশ্রমী হয়ে গড়ে ওঠার পাশাপাশি আরো কিছু বিষয়ে উপকৃত হয়ে থাকে। যেমন- ইতিবাচক মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে, স্বাবলম্বী হতে শেখে, যে শহরে সে বসবাস করে সেই শহর ও শহরের রাস্তা-ঘাট সম্পর্কে পরিচিতি অর্জন করে ইত্যাদি। শিশুদের ক্ষেত্রে সাইক্লিংয়ের আরো কিছু উপকারিতা এখানে উল্লেখ করা হলো :

অনেক শিক্ষকই মন্তব্য করেছেন যে, যেসব শিশু হেঁটে বা সাইকেলে স্কুলে আসে তারা যেসব শিশু গাড়িতে আসা-যাওয়া করে তাদের তুলনায় বেশি সতর্ক থাকে এবং কোনো কিছু শেখার ব্যাপারে অধিক প্রস্তুত থাকে।

সাইক্লিং একটি মজাদার বিষয়। অনেক শিশুর জন্য এটি গাড়িতে ভ্রমণের তুলনায় বেশি উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

সাইক্লিংয়ের মাধ্যমে শিশুরা তাদের নিজ এলাকা চিনে ফেলে এবং নিজেদেরকে এর অংশ মনে করতে শেখে।

ভ্রমণের জন্য একটি উত্তম অভ্যাস গড়ে উঠলে তা আজীবন থেকে যায়।

সাইক্লিংয়ের মাধ্যমে শিশুরা তাদের পছন্দের স্বাস্থ্য অর্জন করতে পারে।

সাইক্লিং শুধু তোমার যুগেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মও সাইক্লিং চালিয়ে যাবে। এটি থেকে সকল বয়সী ব্যক্তিই আনন্দ পেতে পারে। অল্প বয়সে সাইক্লিং শিখা সহজ এবং এটি সারা জীবনই কাজে লাগে।